# ত্বরিত সমীক্ষা প্রতিবেদন

## রাঙামাটিতে ২০১৭ সালে সংঘটিত ভূমিধসের প্রভাব, বর্তমান অবস্থা এবং করণীয়

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

Manusher Jonno Foundation

Sweden
Sverige

# ত্বরিত সমীক্ষা প্রতিবেদন

## রাঙামাটিতে ২০১৭ সালে সংঘটিত ভূমিধসের প্রভাব, বর্তমান অবস্থা এবং করণীয়

জুলাই, ২০১৮

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

**ত্বরিত সমীক্ষা প্রতিবেদন**
রাঙামাটিতে ২০১৭ সালে সংঘটিত ভূমিধসের
প্রভাব, বর্তমান অবস্থা এবং করণীয়

**প্রকাশকাল**
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**সমীক্ষা পরিচালনা**
শেখ গিয়াসউদ্দিন আহ্‌মেদ
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ

নিখিল চাকমা
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার

**সার্বিক তত্ত্বাবধান**
খন্দকার রেজওয়ানুল করিম

**প্রকাশক**
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

**সম্পাদনা**
শাহানা হুদা
কো-অর্ডিনেটর, মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন

**স্বত্ব**
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

**মুদ্রণ**
অর্ক

# সূচি


| | |
|---|---|
| **১. পটভূমি** | **৫** |
| ১.১. গবেষণার যৌক্তিকতা | ৫ |
| ১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য | ৬ |
| ১.৩. গবেষণার সীমাবদ্ধতা | ৬ |
| **২. ভূমিধস সংক্রান্ত খবরাখবর** | **৭** |
| **৩. গবেষণা পদ্ধতি** | **১৩** |
| ৩.১. গবেষণা এলাকা | ১৩ |
| ৩.২. নমুনায়ন | ১৩ |
| **৪. গবেষণালব্ধ ফলাফল** | **১৭** |
| ৪.১. ভূমিধসের কারণ সম্পর্কিত ধারণা | ১৭ |
| ৪.২. জীবন ও জীবিকার ওপর ভূমিধসের প্রভাব | ১৮ |
| ৪.৩. ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় নিজস্ব গৃহীত কৌশল | ১৮ |
| ৪.৪. দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা | ১৯ |
| ৪.৫. দুর্যোগকালীন বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা | ১৯ |
| ৪.৬. দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা | ২২ |
| ৪.৭. দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান | ২৩ |
| ৪.৮. ভবিষ্যতে ভূমিধসের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পলিসি-সংক্রান্ত সুপারিশমালা | ২৪ |
| **নির্বাচিত কেসস্টাডিসমূহ** | |
| ৫.১. কেস - ১ | ৯ |
| ৫.২. কেস - ২ | ১৪ |
| ৫.৩. কেস - ৩ | ২০ |
| **৫. উপসংহার** | **২৭** |
| তথ্যসূত্র | ৩১ |

# ১

**রাঙামাটি ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে গত ১২-১৪ জুন ২০১৭ তারিখে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় ১৬২ জন মারা যায়। নষ্ট হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি, বাগান, ক্ষেত, গৃহস্থালি জিনিসপত্র। রাঙামাটিতে মারা যায় ১২০ জন, চট্টগ্রামে ৩২ জন, বান্দরবানে ৬ জন, খাগড়াছড়িতে ২ জন এবং কক্সবাজারে ২ জন। রাঙামাটি জেলায় প্রাণহানির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৮,৫০০ পরিবার, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় ১,২৩১ বাড়ি, আংশিক বিধ্বস্ত হয় ৯,৫০০ বাড়ি।**

## পটভূমি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দারা এর আগে কখনো ১২-১৪ জুন ২০১৭ তারিখে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিধসের মতো এত বড় দুর্যোগের মুখোমুখি হয়নি। এই ভূমিধসের ব্যাপারে কোনো ধরনের পূর্বাভাস না পাওয়ার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। দুর্গত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

## গবেষণার যৌক্তিকতা

পার্বত্য-চট্টগ্রামে বর্ষা শুরু হওয়ার আগে থেকেই বেশি মাত্রায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে থাকে। ফলে পাহাড়ি এলাকায় আবারও একই ধরনের ভূমিধসের আশংকা করা হচ্ছে। কাজেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসাপেক্ষে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত বলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন মনে করে। এ জন্যই সংস্থাটির পক্ষ থেকে একটি দ্রুত সমীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মূলত ভূমিধসের বিষয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে এই সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় ভূমিধসের কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও প্রভাব; ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় গৃহীত কৌশল; দুর্যোগ-পূর্ব, চলাকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থার ভূমিকা; ভবিষ্যতে ভূমিধসের ঝুঁকি হ্রাস ও ক্ষয়ক্ষতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতি-সংক্রান্ত সুপারিশমালা সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের (ভুক্তভোগী ও সেবাদানকারীসহ) কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়।

## গবেষণার উদ্দেশ্য

- ভূমিধসের কারণ, জীবন-জীবিকার ওপর এর প্রভাব এবং ক্ষতি মোকাবেলায় নিজস্ব উদ্যোগ/কৌশল সম্পর্কে জানা
- ভূমিধস-পূর্ববর্তী, ভূমিধসের সময় এবং ভূমিধস-পরবর্তী সেবা এবং সেবাপ্রদানকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ
- সেবাদান প্রক্রিয়ায় ঘাটতি চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ করণীয় সুপারিশ উপস্থাপন

## গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই ত্বরিত সমীক্ষার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ১২-১৪ জুন ২০১৭ তারিখে সংঘটিত ভূমিধসের পরে ভবিষ্যতের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অল্প পরিমাণ নমুনা নিয়ে এই সমীক্ষা চালানো হয়।

সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারের মধ্যে বিস্তারিত সমীক্ষা চালাতে পারলে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত সংকলিত করা সম্ভব হতো। এর পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের আঞ্চলিক ভাষাও গবেষণায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। গবেষকের এ সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকায় স্থানীয় তথ্য সংগ্রাহকদের ওপর নির্ভর করতে হয়। সময়াভাবে তথ্য সংগ্রাহকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ফলে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও কিছু ঘাটতি থেকে গেছে।

এরপরেও, সীমিত সময় ও মানবসম্পদ এবং আর্থিক বরাদ্দ সত্ত্বেও প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং ভূমিধসের আগে ও পরে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদনের সমন্বয়ে একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

# ভূমিধস -সংক্রান্ত খবরাখবর

ভূমিধস বিশেষ করে, অতিবৃষ্টির কারণে সংঘটিত পাহাড়ধসের ওপর খুব বেশি সেকেন্ডারি তথ্য সূত্র পাওয়া যায়নি। বড় এই পাহাড়ধসের পরে দেশের প্রায় সব দৈনিক পত্রিকায় এ-সংক্রান্ত সংবাদ ছাপা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে অনেক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। এসব সূত্রের মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু সংবাদ ও প্রতিবেদন এই গবেষণার জন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ভূমিধসের প্রথম দিন, বাংলা ট্রিবিউনে আবহাওয়া অধিদফতরের বরাত দিয়ে "সারা দেশে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যাতে বলা হয় যে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারা দেশেই বৃষ্টি হচ্ছে এবং অতি ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধসের আশংকাও রয়েছে।

পরে প্রায় প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাঙামাটিতে সংঘটিত ভূমিধসের সংবাদ পরিবেশিত হয় যেখানে মানুষের মৃত্যুসহ ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসব সংবাদে ভূমিধসউপদ্রুত এলাকার উদ্ধার তৎপরতার অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা হয়। এ সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাঙামাটি ও পাশের জেলাগুলোতে ভূমিধসের ঘটনায় ১৬২ জনের প্রাণহানি ঘটে। অসংখ্য ঘরবাড়ি, বাগান, খেত, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র নষ্ট হয়। প্রাণহানির সংখ্যা ছিল রাঙামাটিতে ১২০ জন, চট্টগ্রামে ৩২ জন, বান্দরবানে ৬ জন, খাগড়াছড়িতে ২ জন এবং কক্সবাজারে ২ জন। প্রাণহানির পাশাপাশি রাঙামাটি জেলায় ১৮,৫০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১,২৩১ বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৯,৫০০ বাড়ি আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়।

১৩ জুন দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় ১২ জুন সংঘটিত ভূমিধসের সংবাদ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। সেখানে দুর্ঘটনা ঘটার সময়ের এবং পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের নানা দুর্ভোগের বিষয় উঠে আসে। পত্রিকাগুলোতে লেখা হয় যে, দুর্ঘটনাকবলিত এলাকা স্বজনহারাদের আর্তনাদ আর আহাজারিতে ভারী হয়ে আছে। এলাকার অন্যদের হাহাকারের খবরও বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়।

১৬ জুন ঢাকা ট্রিবিউন-এর খবরে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাশের জেলাগুলোতে সংঘটিত ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারকাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সে সময় পর্যন্ত ১৫৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। রাঙামাটির সাথে পাশের অন্য জেলাগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা সে সময় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে সেখানকার অধিবাসীদের নানা দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব দেখা দিয়েছে, বাজারে শাক-সবজির মূল্য বেড়েছে। এমন কি পেট্রোল পাম্পগুলোতে পর্যাপ্ত তেলের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে।

১৭ জুন ইংরেজি পত্রিকা গ্রিন ওয়াচের সম্পাদকীয়তে লেখা হয় যে, রাঙামাটিতে ভূমিধসের ফলে যে ক্ষয়-ক্ষতি ঘটেছে তা থেকে জেলাটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে জেলা প্রশাসন ও অপরাপর উদ্ধারকারী সংস্থা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও বিশেষত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা সম্ভব হচ্ছে না।

২০ জুন তারিখের ডেইলি স্টার প্রত্রিকায় "রিপোর্টার্স ডায়েরি" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, ভূমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ ১৯টি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রবন্ধের লেখক হাসান জাহিদ তুষার ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন।

২১ জুন তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার এক রিপোর্টে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া নারীদের নানা সমস্যার কথা প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয় যে, আশ্রয়কেন্দ্রে নারীরা মূলত শৌচাগার ব্যবহার আর পানি-সংক্রান্ত সমস্যায় বেশি দুর্ভোগের কবলে পড়ছে। সংবাদে আরো বলা হয় যে, আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুদের জন্য আলাদা খাবারের ব্যবস্থা নেই। সংবাদটিতে মূলত রাঙামাটি শহরের ভেদভেদি এলাকার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্রে আসা ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগের কথা বেশি আলোচিত হয়।

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ২২ জুন তারিখের এক সংবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলা হয় যে, মন্ত্রণালয় বজ্রপাতকে বিশেষভাবে পাহাড়ধসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছে। এর পাশাপাশি তারা অতিবৃষ্টি, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, অপরিকল্পিতভাবে পাহাড়ের মাটি কাটা এবং আবাসনকে পাহাড়ধসের অন্যতম কারণ বলে মনে করছে।

২৩ জুন ডেইলি স্টার পত্রিকায় মুক্তশ্রী চাকমা সাথী রাঙামাটি শহরকে একটি ভূতুড়ে শহর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২৯ জুন ইংরেজি দৈনিক দি ইনডিপেন্ডেন্ট-এ প্রকাশিত সংবাদে ভূমিধসের কারণে জনমনে সৃষ্ট ভীতির কারণে রাঙামাটির পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সংবাদে বলা হয় যে, ঈদ সামনে রেখে রাঙামাটি শহরে প্রতি বছর পর্যটনের উৎসব শুরু হতে দেখা যায়। কিন্তু এ বছর (২০১৭ সালে) ভয়াবহ ভূমিধসের কারণে পর্যটকদের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং ফলে তারা রাঙামাটিতে ছুটি কাটাতে আসতে ভয় পাচ্ছে।

১৩ জুলাই দৈনিক প্রথম আলোতে মতামত বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার “আপদ ও দুর্যোগের নতুন মাত্রা ভূমিধস” শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়ি এলাকার ভূমিধসের কারণ ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশের পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে আলোচনায় দেখানো হয় যে, বিভিন্ন শীলাস্তরের মধ্যবর্তী স্থানে বৃষ্টির পানি ঢোকার ফলে উপরিস্থিত শীলাস্তর ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসে এবং এভাবেই মূলত পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে থাকে। লেখকের মতে, যেখানেই পাহাড় বা পাশাপাশি দুটি ভূমির উচ্চতার পার্থক্য রয়েছে, সেখানেই ভূমিধসের আশংকা থাকে। তার মতে মানুষের অপরিনামদর্শী আচরণও পাহাড়ধসের পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

## কিরণ চাকমা হারালো প্রিয়জনকে

কিরণ চাকমার বোনের অন্য একটা গ্রামে বিয়ে হয়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে তার বোন এবং দুলাভাই তাদের বাসায় বেড়াতে আসে। দুর্ঘটনার দিন তাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল। সেদিন কিরণ চাকমা সকালে ঘুম থেকে উঠে দুলাভাইয়ের সাথে দুলাভাইয়ের নৌকার পানি ফেলতে যায় এবং পানি ফেলে দেয়া শেষ হলে আবার বাড়িতে চলে আসে। অন্যদিকে রান্নাঘরে কিরণ চাকমার বোন আর স্ত্রী রান্না করছিল। অনেক বৃষ্টি হচ্ছে দেখে নৌকার পানি ফেলে আসার পর তার দুলাভাই আবার কাপড় মুড়িয়ে শুয়ে পড়ে। সামনে দরজায় কিরণ চাকমার মা ও বড় মেয়ে বসে ছিল।

আনুমানিক ১১টার দিকে তার বড় মেয়ে ময়লা পানি ফেলে দেওয়ার জন্য যখন বাইরে

বের হয় তখন পাহাড়ের একটা বিকট শব্দ শুনে চিৎকার করে ওঠে। কিরণ চাকমাও শব্দটা শুনে সেটা কীসের শব্দ বলে জিজ্ঞেস করতে না করতে পাহাড়ের মাটি তাদের আঘাত করে এবং বাড়ির দেওয়াল ভেঙে মাটি তাদের উপর পড়ে যায়। এ সময় তার স্ত্রী আর বোন দুজনে বাইরে ছিটকে পড়ে যায়। সে সাথে কিরণ চাকমাও গলা পর্যন্ত মাটির নিচে চাপা পড়ে। বুদ্ধের আসন (বুদ্ধ রাখার ঘর) তার উপর পড়ে যাওয়ায় সে টের পায় যে সে মাটির নিচে আছে। প্রচুর বৃষ্টির কারণে মাটি নরম থাকায় সে কোনভাবে সেখান থেকে উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পালিয়ে যে জায়গায় দাঁড়ায় সেখানে সে তার স্ত্রী ও বোনকে দেখতে পায়। সে দেখে যে, তার স্ত্রীর হাত পা কেটে গেছে আর বোনের হাত ভেঙে গেছে। তারপর তাদের দুজনকে এক জায়গায় সরিয়ে রেখে তার মেয়ে ও মাকে খুঁজতে বের হয়। এরপর মেয়েকে মাটির নিচে খুঁজে পায়। মেয়েটির হাত পা সব ভালো ছিল এবং নড়াচড়া করতে পারছিল, কিন্তু মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় কথা বলতে পারছিল না। চোখও ঠিকমতো খুলতে পারছিল না।

এরপর কিরণ চাকমা তার মাকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনে। সে দেখে যে, তার মায়ের বাম পায়ের হাড় ভেঙে শুধু চামড়া ঝুলে আছে। তার মা কথা বলতে পারছিল; কিন্তু পা ভেঙে যাওয়ায় হাঁটতে পারছিল না। কিরণ তাদের একটা বটগাছের নিচে রেখে আবার দুলাভাইকে খুঁজতে যায়। যেখানে তার দুলাভাই ঘুমিয়ে ছিল, সেখানে গিয়ে মাটির নিচে হাত আর পায়ের অস্তিত্ব টের পায়। দুলাভাইয়ের হাত ও পা তখনও গরম ছিল। কিরণ নিজে একা তাকে উদ্ধার করতে সাহস পায় না। সে দ্রুত আর একজনের বাড়িতে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসে এবং এসে দুজনে একসাথে তার দুলাভাইকে মাটির নিচ থেকে বের করে। কিন্তু সে তখন মারা গেছে।

একই ধারায় বৃষ্টি পড়তে থাকে। এ সময় তার মা বলতে থাকে যে, সে মনে হয় আর বাঁচবে না। এরকম করতে করতে তার মাও সেখানে মারা যায়। তারপর কিরণ তার মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেয়। পথে মানিকছড়ি নামক জায়গায় তার মেয়ে একটু বমি করে এবং পরে হাসপাতালে পৌঁছালে ডাক্তার অক্সিজেন লাগিয়ে দেয়। পরে ধীরে ধীরে তার মেয়ের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করে।

কিরণ এ পর্যায়ে স্বজনদের মৃতদেহগুলো নিয়ে তার বড় ভাইয়ের বাড়িতে চলে যায়। বড় ভাইয়ের বাড়িতে দাহকার্য ও সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এবং সেখানে ১-২ মাস পর্যন্ত বসবাস করে।পাহাড়ধসের পর তারা কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে যায়নি। কারণ সেখানে কোনো আশ্রয়কেন্দ্র ছিল না।

এই পাহাড়ধসে তার ঘরের ক্ষতি হয়। তার ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যায়। কিরণের ধানের জমির পরিমাণ ছিল ২-২.৫ কানি যা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সে সাথে শাকসবজির খেত ছিল যার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায় এবং কিছু অংশ ভালো ছিল। তার কাছে কিছু জমানো টাকা ছিল যা পরে খুঁজে পায়। তার বাসায় একটি পোষা বিড়াল ও ২০/২৫টি মুরগি ছিল। বিড়াল ও প্রায় সব মুরগি মারা যায়, শুধু একটি মুরগি বেঁচে ছিল।

ভূমিধসের এই ঘটনা ঘটার পর তাদের এলাকায় কারা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে আসে সে বিষয়ে কিরণ চাকমা সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। শুধু এইটুকুই বলতে পারে যে, যখন ক্ষতি হয়েছিল তখন মেম্বার, চেয়ারম্যানরা ইউপি থেকে এসে খোঁজ খবর নিয়েছিল। শুধু যেসব পরিবারে মানুষ যারা গেছে বা আহত হয়েছে সেসব পরিবারের খোঁজ নিয়েছিল তারা।

পাহাড়ধসের পর কিরণ চাকমা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা পায়। মা ও মেয়ে মারা যাওয়ার ৩-৪ দিন পরে উপজেলা অফিস থেকে ৪০,০০০ টাকা পায়। ডিসি অফিস থেকে কিরণ চাকমা ও তার স্ত্রী আহত হিসাবে ৫,০০০ টাকা করে ১০,০০০ টাকা পায়। এই টাকার সাথে ডিসি অফিস থেকে চাল পায় ৩০ কেজি আর একটা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে চাল পায়; কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের নাম জানে না।

ঘটনার ২-৩ মাস পর তারা ইউএনডিপি থেকে ১৫,২০০ টাকা পায়। এরপর আনুমানিক ৫ মাস পরে সিআইপিডি থেকে ৫,০০০ টাকা পায়। পরে আরো ৮,২০০ টাকার সাথে ২ বান টিন পায় কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে দিয়েছে, সে তা বলতে পারে না। তারপর ঢাকার কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২,০০০ টাকা পায়। এখন শাকসবজি ও ধনিয়া পাতার চাষ করে এবং দিনমজুরের কাজ করে কিরণ সংসার চালায়।

কিরণ চাকমা মনে করে যে, আগেকার সময় নাকি বিদেশিরা (গ্যাস কোম্পানি নামে চিনে) তেলের খনি, লবণের খনি খোঁজার জন্য মাটি নিচে এক ধরনের পিলার ফেলে দিত। এখন ওই পিলারগুলো তুলে নিয়ে যাওয়ার ফলে এরকম ঘটনা ঘটছে। তার জীবনে সে এমন ঘটনা দেখেনি এবং তার বাবা তার দাদা, বাবাদের কাছেও এমন দুর্যোগের কথা কখনও শোনেনি। এখন সে লোকমুখে বিভিন্ন যায়গায় শুনতে পায় যে, আগামীতে আরো ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটতে পারে।

ভবিষ্যতের পাহাড়ধস মোকাবেলায় কিরণ চাকমা কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানায়। শুধু কোনো খারাপ খবর শুনলে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। কারণ তাদের মনে এখন ভয় কাজ করে।

**কিরণ চাকমা**
মরংছড়ি পাড়া
২ নং মগবান ইউনিয়ন পরিষদ
রাঙামাটি

৩

# গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ধরনের ভিত্তিতে মূলত একটি গুণগত ত্বরিত সমীক্ষা। গুণগত গবেষণার অনেক ধরনের পদ্ধতি থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরির জন্য এই গবেষণায় তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে:

১) পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত আনুষঙ্গিক তথ্য ও প্রবন্ধ বিশ্লেষণ
২) কেসস্টাডি
৩) সাক্ষাৎকার

## ৩.১. গবেষণা এলাকা

সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং আর্থিক বরাদ্দ কম থাকায় শুধু ইস্যুটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য দুইটি স্থান এই সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়। রাঙামাটি সদর উপজেলার মগবান ও সাপছড়ি ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় এই গবেষণার তথ্য সংগৃহীত হয়। গবেষণা এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে যুক্তিগুলো বিবেচনা করা হয়:

- সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা
- সীমিত সুযোগের মধ্যে দুটি পৃথক এলাকার ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত লাভ
- গবেষণা এলাকায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থার কার্যকর উপস্থিতি
- স্বল্পতম সময়ে সম্ভাব্য সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহের সুযোগ

## ৩.২. নমুনায়ন

সংক্ষিপ্ত এই গবেষণার জন্য সাতটি কেসস্টাডি এবং ১৪ জন প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ভূমিধসের ফলে কমপক্ষে একজন মারা গেছে অথবা বাড়িঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে এমন পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই কেবল কেসস্টাডির তথ্য সংগৃহীত হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়:

- মাননীয় সাংসদ, রাঙামাটি জেলা
- সদস্য, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাঙামাটি
- ডি আই ১, পুলিশ সুপার কার্যালয়, রাঙামাটি
- সহকারী পরিচালক, ফয়ার সার্ভিস, রাঙামাটি
- সচিব, চাকমা সার্কেল অফিস, রাজবাড়ি, রাঙামাটি
- এসিএফ, বন বিভাগ, রাঙামাটি
- কমিশনার, রাঙামাটি পৌরসভা, রাঙামাটি
- পি.আই.ও, রাঙামাটি সদর
- চেয়ারম্যান, ৬নং বালুখালী ইউনিয়ন, রাঙামাটি সদর, রাঙামাটি
- চেয়ারম্যান, সাপছড়ি ইউনিয়ন, রাঙামাটি
- সদস্য, ১৩ নং ইসলামপুর ইউনিয়ন, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
- স্থানীয় সংবাদকর্মী, রাঙামাটি
- স্থানীয় উন্নয়নকর্মী, রাঙামাটি

কেসস্টাডিতে তথ্যদাতাদের সাতজনের মধ্যে ৪ জন নারী। অন্যদিকে যারা সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ১৪ জনের প্রত্যেকেই পুরুষ। তথ্যদাতা সবার মধ্যে ১২ জন আদিবাসী।

## শাহনাজ বেগম স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র চান

শাহনাজ বেগম পেশায় একজন দিনমজুর। সে স্বামী, তিন কন্যা এবং এক নাতিসহ রাঙামাটি শহরের শিমুলতলী এলাকায় একটি পাহাড়ের ঢালে বসবাস করে। তার স্বামী মনসুর আলী, ১৩/১৪ বছর আগে এই জমি স্থানীয় এক মহাজনের কাছ থেকে লীজ হিসেবে নেয়।

গত ১৩ জুন সারা দিনরাত বৃষ্টি হয়। সে সময় এলাকার অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙে যায় এবং এক পরিবারের সাতজনসহ পাড়ার অন্যান্য লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে দিন সন্ধ্যার সময় এলাকার কয়েকজন যুবক এসে তাদের ঘর থেকে বাইরে বের হতে বলে। এই অবস্থায় তারা এক পোশাকে সবাই বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। তাদের পাড়ার অনেকের ঘরবাড়ি পুরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অনেকের ঘরবাড়ি মাটিচাপা পড়ে। তাদের যে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ছিল সব মাটির নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। সে তার বাড়ির কোনো আসবাবগত্র বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছুই বাঁচাতে

পারেনি। তার পাশের বাড়ির এক পরিবারের ৬ জন সদস্যের সবাই মাটিচাপা পড়ে মারা যায়।

স্বেচ্ছাসেবকরা (এলাকার যুবক) তাদের বেতারকেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বলে। সেখানে গিয়ে তাদের চিড়া আর গুড় রাতের খাবার হিসেবে খেয়ে কোনোমতে রাত কাটাতে হয়। সেখানে সে পরিবার নিয়ে ৩ মাস পর্যন্ত অবস্থান করে। সেখানে তাদের নিয়মিত খাবার দেওয়া হতো।

সেখানে যাওয়ার সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থায়ীভাবে নিরাপদ জায়গায় পুনর্বাসন করা হবে। সেখান থেকে তাদের ৩ মাসের জন্য মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সেখানে ছোট ছোট এক একটি কক্ষে ৬/৭টি পর্যন্ত পরিবারকে রাখা হয় এবং নারী ও পুরুষদের জন্য কোনো পৃথক থাকার ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে জায়গার এতই অভাব ছিল যে, রাত্রে নারীরা আশ্রয়কেন্দ্রে থাকত, আর পরিবারের পুরুষ সদস্যদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে কাটাতে হতো। আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের কোনো আলাদা ব্যবস্থা ছিল না।

৩ মাস পরে সেই আশ্রয়কেন্দ্রের সকলকে কিছু টাকা, চাল আর ঘরের টিন বিতরণ করে যার যার ঘরে ফিরে যেতে বলা হয়। অন্যান্য বেসরকারি এনজিও সংস্থাসহ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে তারা নানা ধরনের সহযোগিতা পায়। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কাপড়, লুঙ্গি, শাড়ি, ম্যাক্সি, থালাবাসন, শুকনা খাবার, সেনিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

পাহাড়ধসের কারণ সম্পর্কে তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা দেখা যায় না। তবে তারা মানুষজনের কাছ থেকে শুনেছে যে, অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত হওয়ার কারণে নাকি এ ধরনের পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। তবে তারা জানায় যে, বিগত ১৩/১৪ বছরে এই এলাকায় এ ধরনের দুর্যোগ তারা দেখেনি। এ এলাকায় যারা আদিকাল থেকে বসবাস করছে তাদের কাছ থেকেও এমন বড় দুর্যোগের কথা তারা শোনেনি। পাহাড়ধস হতে পারে এমন কোন খবর তারা কারও কাছ থেকে পায়নি। ঘটনার পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়।

তার মতে পরবর্তী সময়ে পাহাড়ধসের কারণে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জনগণকে সচেতন করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ জায়গায় পুর্নবাসন করতে হবে বলে সে মতামত দেয়।

**শাহনাজ বেগম**
শিমুলতলী
রাঙামাটি

# ৪

## গবেষণার ফলাফল

গবেষণা থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলোকে নিচের ক্লাস্টারের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হলো:

- ভূমিধসের কারণ সম্পর্কে ধারণা
- জীবন ও জীবিকার ওপর ভূমিধসের প্রভাব
- ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় নিজস্ব গৃহীত কৌশল
- দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা
- দুর্যোগকালীন বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা
- দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা
- দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান
- ভবিষ্যতে ভূমিধসের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পলিসি-সংক্রান্ত সুপারিশমালা

গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণে মূলত তথ্যদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় গবেষকের মতামতও তুলে ধরা হয়েছে– যা নিচে আলোচনা করা হলো:

### ৪.১. ভূমিধসের কারণ সম্পর্কে ধারণা

সাধারণভাবে ভূমিধসের কারণ সম্পর্কে তথ্যদাতাদের মধ্যে খুব সুস্পষ্ট ধারণা দেখা যায়নি। তারা বেশ কিছু প্রাকৃতিক, মানুষের তৈরি ও দৈব ব্যাখ্যা দিয়েছে মাত্র। প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টি, হঠাৎ করে বজ্রপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি, রাঙামাটির অধিকাংশ মাটি বালি/নরম, মাটির অবস্থা আঠালো নয়, বজ্রপাতের ফলে মাটি নরম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

মানুষের তৈরি কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পাহাড় কেটে অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, পাহাড়ে বাসস্থান তৈরিতে ঐতিহ্যবাহী ও সাধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে ক্ষতিকর পদ্ধতি ব্যবহার, অপরিকল্পিতভাবে বন ধ্বংস, অতিরিক্ত সেগুন গাছ লাগানো যা মাটির ব্যাপক ক্ষতি করছে, পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃক্ষরোপণ না করা, পাহাড়ের ঢালু জায়গায় বসবাস, ইটভাঁটার জ্বালানি হিসেবে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা এবং পাহাড়ের নিচে বসতির আশেপাশের মাটি কেটে ইটভাঁটায় ব্যবহার করা, বিল্ডিং কোড না মানা ইত্যাদি।

মাত্র একজন তথ্যদাতা বলেন, দেবতার অসন্তুষ্টির কারণে এ ধরনের দুর্যোগ হচ্ছে।

তিনজন তথ্যদাতা কিছুটা ব্যতিক্রমী ও অপেক্ষাকৃত বেশি যুক্তিপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা করেছে। তাদের মতে, এই দুর্যোগের কারণ হলো, রাস্তা নির্মাণ বা সম্প্রসারণের সময় ভূমির গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে জরিপ না করে সুপরিকল্পিতভাবে রাস্তা নির্মাণ না করার প্রবণতা। যে হারে মানুষ বাড়ছে হয়তো সে হারে গাছপালা রোপণ করা হচ্ছে না এবং কাপ্তাই বাঁধের ফলে ভূগর্ভস্থ মাটি নরম হয়ে পড়ছে।

## ৪.২. জীবন ও জীবিকার ওপর ভূমিধসের প্রভাব

যারা তথ্য দিয়েছেন তাদের আলোচনা থেকে ভূমিধসের ফলে ভুক্তভোগীদের প্রাণহানির পাশাপাশি আরো নানা ধরনের যেমন কৃষিজ, সামাজিক এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উঠে আসে। এসব ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তারা খুব সুনির্দিষ্ট করে ক্ষতির পরিমাণ বলতে না পারলেও ভূমিধসের ফলে তাদের বিপুল ক্ষতির আভাস পরিষ্কারভাবেই ফুটে ওঠে। যেমন, তথ্যদাতাদের প্রত্যেকের পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্য মারা যায়; পরিবারগুলোর এক বা একাধিক সদস্য গুরুতর আহত হয়; প্রত্যেকের বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ধসে যায়; একজনের ১.৫ থেকে ২ একর মিশ্র ফলদ, সেগুন, গামারী বাগান নষ্ট হয়; আরেকজনের ২ থেকে ২.৫ কানি ধানি জমি মাটির নিচে চাপা পড়ে, ফলে সেখানে আর চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না; পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়া; ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বেঁচে থাকার তাগিদে বর্তমান আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া। আহতরা এখনও শারীরিক অসুস্থতা বয়ে বেড়াচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মানসিক ট্রমার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে এসেছে। যেমন তারা বলেছে, "এখন একটু বৃষ্টির শব্দ হলে গা শিউরে উঠে", "আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলে এবং একটু বৃষ্টিপাত হলে সারা রাত না ঘুমিয়ে বসে থাকি"।

## ৪.৩. ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় নিজস্ব গৃহীত কৌশল

ভূমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী নানা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পায়। সেই সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় তারা নিজেরাও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করে। যেমন,

আত্মীয় প্রতিবেশীর কাছ থেকে অর্থ ও যেমন চাল, ডাল, খাবার সহায়তা, গবাদিপশু ও বাগান ইত্যাদি বিক্রি করা, চড়া সুদে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ (৫০,০০০ টাকা), ঘরবাড়ি নষ্ট হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদি।

## ৪.৪. দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা

এ ধরনের একটা বড় দুর্যোগ হতে যাচ্ছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ভারী বর্ষণ এবং ভূমিধসের পূর্বাভাস থাকলেও মূলত ভূমিধসের আশংকা কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কিংবা ভুক্তভোগী কেউই খুব গুরুত্বের সাথে আমলে নেয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় কোনো প্রকার আগাম প্রস্তুতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি ভূমিধসের ঝুঁকিপূর্ণ বসতির কোনো হালনাগাদ তথ্যও ছিল না।

## ৪.৫. দুর্যোগকালীন বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা

### ক. সমন্বয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান– রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক এবং প্রথাগত। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যক্রমের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের অফিস মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করলেও আঞ্চলিক ও প্রথাগত প্রশাসনিক দক্ষতাকে কাজে না লাগানোর কথাও গবেষণার তথ্য থেকে উঠে আসে।

### খ. উদ্ধার তৎপরতা

ভূমিধস সম্পর্কে আগাম সতর্কতামূলক কোনো প্রস্তুতি না থাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারকারী হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় জনগণ ও ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যদের কথা উঠে আসে। এরপর জেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উদ্ধারকাজে যুক্ত হয়। তবে, শহরের বাইরের উপদ্রুত এলাকায় সরকারিভাবে উদ্ধার তৎপরতা চালানো সম্ভব হয়নি বলে তথ্য পাওয়া যায়। স্থানীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের অভাবের বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে উঠে আসে। এমনকি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আনার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণকারী ৫ জন সেনাসদস্যের মৃত্যু ঘটে।

## সব চাপা পড়ে গেল পাহাড়ের নিচে

পূর্ণ চন্দ্র চাকমা চাকরির সুবাদে বরকল উপজেলায় অবস্থান করলেও তার পরিবার সাপছড়ি ইউনিয়নে বোধিপুর গ্রামে বসবাস করে। ১২ জুন ২০১৭ ইং তারিখ হতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হয়। ১৩ তারিখ নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পাড়াপ্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন পূর্ণ চন্দ্র চাকমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সে সময় সে কর্মস্থল বরকল উপজেলায় অবস্থান করছিল। রাঙামাটি শহরসহ অন্যান্য উপজেলায় বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাত বেশি হওয়ায় সে খুবই উৎকণ্ঠায় ছিল। বাসা থেকে দূরে অবস্থান করলেও সে সার্বক্ষণিকভাবে বাড়ির লোকজনের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেদিন সে বাড়ির কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি।

পাহাড়ধসে তার নানি, কাকাতো বোন এবং স্ত্রী মাটিচাপা পড়ে মারা যায়। পূর্ণ চন্দ্রের বাবা বাড়ির এক কোণে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। একদিন পরে পূর্ণ তার এলাকার বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভান্তে জিনবোধির সাথে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। তিনি পূর্ণকে এলাকা সর্ম্পকে বিস্তারিত খুলে বলেন। তিনি বলেন যে, তাদের (পূর্ণ চন্দ্র চাকমার) বাড়ি তিন ভাগ হয়ে গেছে এবং পুরো গ্রাম পানিতে ডুবে গেছে। যদিও পরিবারের বা তার স্ত্রীর ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে চাননি। ঐ দিন ৩ হাজার টাকা ভাড়া বোট নিয়ে সরাসরি রাঙামাটি শহরে চলে আসে পূর্ণ চন্দ্র। রাঙামাটি শহর থেকে পুরো উপজেলা এবং অন্যান্য ইউনিয়নে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে কোনোমতে পায়ে হেঁটে বাড়িতে আসে। আসার পর দেখতে পায় যে, তার নানি এবং বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া কাকাতো বোন নিথর অবস্থায় পড়ে আছে। তখনও তার স্ত্রীকে মাটির তলা থেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার বাবা এবং সে বাড়ির এই অবস্থা দেখে নির্বাক হয়ে পড়ে। সে মনে করে যে, পাহাড়ধসের সময় সে ও তার ভাই বাসায় থাকলে তাদেরও একই পরিণতি হতো।

পাহাড়ধসের ফলে পূর্ণ চন্দ্র চাকমার পরিবারের প্রায় ১.৫ থেকে ২ একর জমির পরিমাণ ফলমূল গাছ (লিচু, কলা, কাঁঠাল, আম, আঙুর, কমলা, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদি) নষ্ট হয়। তাদের ঘরবাড়ি তিন ভাগ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাড়িতে যা ছিল যেমন- ফ্রিজ, টেলিভিশন, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, ধান ক্ষেত, পুকুর ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়।

পূর্ণ চন্দ্র চাকমা জানায় যে, দুর্ঘটনার দিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় কোন সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা আসেনি। পাড়াপ্রতিবেশী সবাই মিলে তাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছে তা প্রশংসনীয়।

ঘটনার ২/৩ দিন পর মৃতদেহ সৎকারের জন্য জেলা পরিষদ থেকে প্রতি মৃতদেহের জন্য ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল যেমন- রাজপরিবার, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থানীয় এনজিও সিআইপিডি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে।

পাহাড়ধস হতে পারে সে ধরনের কোনো খবর গ্রামের লোকজন পায়নি। পাহাড়ধসের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে পূর্ণ চন্দ্র চাকমা মতামত দেন যে, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, স্থানীয় গাছের পরিবর্তে বিদেশি (সেগুন) গাছ লাগানো এবং বন উজাড় সবচেয়ে বেশি দায়ী। তার জানা মতে, এমন ধরনের দুর্ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেনি।

বিগত সময়ে পাহাড়ধস মোকাবেলার জন্য সে ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে সিআইপিডির পক্ষ থেকে রির্সোস সেন্টার স্থাপন করা হয়। সেখানে গ্রামের লোকজন আশ্রয় নেয় এবং অনেকেই আত্মীয়-স্বজনের বাসায়ও আশ্রয় নেয়।

পূর্ণ চন্দ্র চাকমার মতে, এলাকায় পাহাড়ধস মোকাবেলা করার জন্য প্রথমে বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধাসহ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা প্রয়োজন। দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক খাবারের ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা, সম্ভাব্য দুর্যোগ হতে পারে এমন অবস্থায় আগে থেকে মাইকিং করা এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

**পূর্ণ চন্দ্র চাকমা**
বোধিপুর
সাপছড়ি
রাঙামাটি

## ৪.৬. দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা

### ক. ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ক্ষয়ক্ষতি ও ভুক্তভোগীদের চাহিদা নিরূপণ। এই দুর্যোগের ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পরিষদের সমন্বয়ে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কথা তথ্যপ্রদানকারীদের আলোচনায় উঠে এলেও ভুক্তভোগীদের তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা নিরূপণ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। জেলা ও উপজেলা পরিষদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজে অংশ নিলেও ভুক্তভোগীরা সুনির্দিষ্ট করে তাদের নাম বলতে পারেনি।

### খ. দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তা

দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় তথ্যদাতাদের আলোচনা থেকে উঠে আসে - আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা।

### গ. আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা করে এবং জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে সমন্বিতভাবেও ভুক্তভোগীদের আর্থিক সহযোগিতা করে। তথ্যদাতাদের মতামত থেকে বিভিন্ন অংকের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো–

- জেলা পরিষদ মৃতদের সৎকারের জন্য জনপ্রতি ৪০ হাজার টাকা এবং আহতদের হাসপাতালে থাকাকালীন ঔষধপত্র দিয়েছে।
- জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহতদের জনপ্রতি ৫,০০০ - ১০,০০০ টাকা; পরিবারপ্রতি ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা ও ৩০ কেজি চাল এবং বাসস্থান পুনর্নির্মাণের জন্য ২ বান্ডিল করে টিন ও ৬,০০০ - ৮,২০০ টাকা করে দেওয়া হয় (একজন ভুক্তভোগী এনজিও থেকে ৮৪,০০০ টাকা পায়)
- রাজপরিবার, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, স্থানীয় এনজিও এবং বিভিন্ন সংগঠন আর্থিক, খাদ্য ও পরিধেয় সামগ্রী সহায়তা দিয়েছে।

তবে প্রদত্ত সহযোগিতা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল।

উল্লেখ্য, কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া গেলেও কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা না দেওয়ার বিষয়টি গবেষণায় উঠে আসে।

### ঘ. আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

পার্বত্য এলাকায় ইতোপূর্বে এত বড় দুর্যোগের ঘটনা না ঘটায় সেখানে কোনো ধরনের আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। ফলে দুর্যোগের পর পরই আহত ও উপদ্রুত মানুষদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী ভিত্তিতে আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন– বেতার কেন্দ্র, হাসপাতাল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিআইপিডি-এর রিসোর্স সেন্টার, ভেদভেদি উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি। কেস স্টোরির তথ্যপ্রদানকারীদের দুইজন ছাড়া বাকি সবাইকেই কোনো না কোনো সময়ে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়।

অস্থায়ী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হওয়ার কারণে আশ্রয়কেন্দ্রভেদে সুযোগ-সুবিধার ভিন্নতার তথ্য পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও পরিবারভিত্তিক আলাদা আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা থাকলেও সার্বিকভাবে অনেকগুলো পরিবারকে একসাথে একটি ঘরে অবস্থান করতে হয়। কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে পুরুষরা আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে রাত কাটাতে বাধ্য হয়, যখন তাদের পরিবারের অন্য সদস্যরা আশ্রয়কেন্দ্রে রাত কাটায়। তবে, প্রায় সব তথ্যপ্রদানকারী মতামত দেয় যে, আশ্রয়কেন্দ্রে তাদের থাকার সময়টা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল। আরো বেশি দিন আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে পারলে তাদের সুবিধা হতো। অনেক সময় ভুক্তভোগীদের একাধিক আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিতও হতে হয়। ভুক্তভোগী অনেকে একটি আশ্রয়কেন্দ্র থেকে অন্য আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে সম্মত না হওয়ায় আত্মীয় প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

## ৪.৭. দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইনের ২২ ধারায় উল্লিখিত কার্যাবলির উপধারা (ছ)-এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার উল্লেখ থাকলেও ২০১৭ সালে সংঘটিত ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় আঞ্চলিক পরিষদের ভূমিকার কোনরকম তথ্য এই গবেষণায় উঠে আসেনি। অন্যদিকে রাঙামাটি জেলা পরিষদ আইনের তফসিল-১-এ উল্লিখিত কাজের মধ্যে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার উল্লেখ নেই। তবে গবেষণায় জেলা পরিষদের ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু কিছু সহায়তা দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি-২০১০)-তে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রম উন্নয়ন বোর্ড-এর দায়িত্বে উল্লেখ থাকলেও আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকার কোনো রকম উল্লেখ স্থায়ী আদেশে নেই, যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এসওডিতে উন্নয়ন বোর্ডের দয়িত্বের মধ্যে যে তিনটি কাজের কথা বলা আছে, উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব কাজের মধ্যে (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪)-এর একটিরও উল্লেখ নেই।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা (প্রথাগত কাঠামোসহ) দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন ধরনের, সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রয়োজন, যাতে সব ধরনের প্রতিষ্ঠান এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যেমে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা করা যায়।

## ৪.৮. ভবিষ্যতে ভূমিধসের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পলিসি-সংক্রান্ত সুপারিশমালা

বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনার মধ্য থেকে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং নীতিনির্ধারণী সুপারিশগুলো উপস্থাপিত হলো, যার অধিকাংশই তথ্যপ্রদানকারীদের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সুপারিশগুলোকে কমিউনিটি পর্যায়, স্থানীয় প্রশাসন/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়– এই তিন ভাগে উপস্থাপন করা হলো। বেশির ভাগ মতামত ইতিবাচক পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলে। একজনের মতামত পরিবেশের জন্য নেতিবাচক হলেও তথ্যদাতার অভিমত হিসেবে এই সুপারিশমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### ক. কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয়

- ভূমিধসের কারণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা

- স্থানীয় প্রজাতির ঐতিহ্যবাহী গাছগাছালি আবার রোপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা
- বনভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও বেশি বেশি গাছ লাগানো
- মাটির উর্বরতা নষ্ট করে বা পাহাড়ের জন্য ক্ষতিকর এমন গাছ (সেগুন) বসতভিটার আশপাশে রোপণ না করা
- পাহাড়ভিত্তিক সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা এবং ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ও স্কুল পর্যায়ে সতর্কবার্তা প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া

## খ. স্থানীয় প্রশাসন/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয়

- পাহাড়ের ভৌগোলিক কাঠামোর জন্য ক্ষতিকর এমন অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধ করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ও বসবাসকারী জনগণকে নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন করা
- যে সমস্ত রাস্তা-ঘাট ভেঙে গেছে বর্ষা মৌসুমের আগে সেগুলো মেরামত করা এবং রাস্তা নির্মাণ বা সম্প্রসারণের সময় ভূমির গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে জরিপ করে সুপরিকল্পিতভাবে রাস্তা নির্মাণ করা
- দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য অগ্রিম স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- দুর্গত এলাকার তাৎক্ষণিক উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি মজুত রাখা
- যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হলে বিকল্প পন্থা চিহ্নিত করে রাখা
- বর্ষা মৌসুমের আগে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি মজুত করা
- বৃষ্টির সময় পাহাড়ের পানি প্রবাহের জন্য বড় বড় ড্রেনেজের ব্যবস্থা করা
- বনভূমি সংরক্ষণ করা, বেশি বেশি গাছ লাগানো এবং বনবিভাগ থেকে তদন্ত করে ঝুঁকিপূর্ণ গাছ কেটে ফেলা
- সম্ভাব্য দুর্যোগ হতে পারে এমন অবস্থায় আগে থেকে সতর্কতামূলক মাইকিং করা, দুর্যোগ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ
- পাহাড়ের পাদদেশে যাতে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বাড়ি তৈরি না করে সে ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি করা

- পাহাড় কেটে সমতল ভূমি করে ফেলা (বেশির ভাগ মতামত ইতিবাচক পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলে। একজনের মতামত পরিবেশের জন্য নেতিবাচক হলেও তথ্যদাতার অভিমত হিসেবে এই সুপারিশমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)

## গ. নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে করণীয়

- ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধন এবং পাহাড় কাটা বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা
- পাহাড়ে বাসস্থান নির্মাণের জন্য বিশেষ নীতিমালা (পরিবেশবান্ধব ও পাহাড়ের কাঠামোর প্রতি সহায়ক) প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন
- বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার উপযোগী (multipurpose) আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং স্থানীয় প্রথা-রীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবস্থাপনা করা। আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক চাহিদাভিত্তিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- কমিউনিটিভিত্তিক বনভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা (ভিসিএফ) এবং স্থানীয় প্রজাতির ঐতিহ্যবাহী গাছগাছালি রোপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং জনবসতির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পাহাড়ের জন্য ক্ষতিকর গাছ (সেগুন) লাগানো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা
- পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা (প্রথাগত কাঠামোসহ) দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, সেক্ষেত্রে এতদঅঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যাতে সব প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা করা যায়

# উপসংহার

বাংলাদেশে পাহাড়ি এলাকায় প্রায় প্রতি বছর ছোট ছোট পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে থাকে। এর মধ্যে ২০১৭ সালের ১২-১৪ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাশের জেলাগুলোতে যে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে, তাতে ১৬২ জনের প্রাণহানি ঘটে, অসংখ্য ঘরবাড়ি, বাগান, ক্ষেত, ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট হয়। প্রাণহানির ঘটনার মধ্যে রাঙামাটিতে ১২০ জন, চট্টগ্রামে ৩২ জন, বান্দরবানে ৬ জন, খাগড়াছড়িতে ২ জন এবং কক্সবাজারে ২ জন মারা যায়।রাঙামাটি জেলায় প্রাণহানির পাশাপাশি ১৮,৫০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১,২৩১ বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৯,৫০০ বাড়ি আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এই ভূমিধসের ঘটনায় এর কারণ, জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব, ক্ষতি মোকাবেলায় নিজস্ব উদ্যোগ/কৌশল সম্পর্কে জানা; দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সেবা এবং সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ; এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও ভবিষ্যৎ করণীয় সুপারিশ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি ত্বরিত সমীক্ষা পরিচালনা করে।

মূলত গুণগত এই সমীক্ষায় পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত আনুষঙ্গিক তথ্য ও প্রবন্ধ বিশ্লেষণ, কেস স্টাডি এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংক্ষিপ্ত সময় এবং সীমিত সম্পদের মাধ্যমে শুধু ইস্যুটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য রাঙামাটি সদর উপজেলার মগবান ও সাপছড়ি ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় এই গবেষণার তথ্য সংগৃহীত হয়। এই গবেষণায় মূলত ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। যারা তথ্যদাতা তাদের মধ্যে সাধারণভাবে ভূমিধসের কারণ সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট ধারণা দেখা যায়নি। তারা বেশ কিছু প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট ও দৈব ব্যাখ্যা দিয়েছে। প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টি; হঠাৎ করে বজ্রপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি; রাঙামাটির অধিকাংশ মাটি/বালি নরম; মাটির অবস্থা আঠালো নয়; বজ্রপাতের ফলে মাটি নরম হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পাহাড় কেটে অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, পাহাড়ে বাসস্থান তৈরিতে ঐতিহ্যবাহী ও সাধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে ক্ষতিকর পদ্ধতি ব্যবহার, অপরিকল্পিতভাবে বন ধ্বংস, অতিরিক্ত সেগুন গাছ লাগানো যা মাটির ক্ষতি করছে, পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃক্ষরোপণ না করা, পাহাড়ের ঢালু জায়গায় বসবাস, ইটভাঁটার জ্বালানি হিসেবে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা

এবং পাহাড়ের নিচে বসতির আশে পাশের মাটি কেটে ইটভাঁটায় ব্যবহার করা, বিল্ডিং কোড না-মানা ইত্যাদি। ভূমিধসের কারণের মধ্যে দেবতার অসন্তুষ্টির কারণে এ ধরনের দুর্যোগ হচ্ছে এমন মতও পাওয়া যায়।

ভূমিধসের ফলে ভুক্তভোগীদের প্রাণহানির পাশাপাশি আরো নানা ধরনের ভৌত (মানবসম্পদ এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ), কৃষিজ, সামাজিক এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। যদিও তথ্যপ্রদানকারীরা সবাই খুব সুনির্দিষ্ট করে ক্ষতির পরিমাণ বলতে পারেনি, তথাপি ভূমিধসের ফলে তাদের বিপুল ক্ষতির বিষয়টি পরিষ্কারভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মানসিক ট্রমার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী নানা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা লাভ করে। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এই সহযোগিতার পাশাপাশি তারা নিজেরাও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ভারী বর্ষণ এবং ভূমিধসের পূর্বাভাস থাকলেও মূলত ভূমিধসের আশংকা কেউই খুব গুরুত্বের সাথে আমলে নেয়নি। ফলে পাহাড়ধসের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কোনো ধরনের আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের উদ্যোগ দেখা যায়নি। এমনকি ভূমিধসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বসতির হালনাগাদ তথ্যও কারো কাছে ছিল না।

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যক্রমের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের অফিস মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে, তবে আঞ্চলিক ও প্রথাগত প্রশাসনিক দক্ষতাকে কাজে না লাগানোর বিষয়ে তথ্যপ্রদানকারীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়। স্থানীয় জনগণ, প্রতিবেশী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা তাৎক্ষণিকভাবে দুর্গতদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উদ্ধারকাজে যুক্ত হয়। এই তৎপরতা মূলত শহরাঞ্চলে বেশি দেখা যায়। তবে, স্থানীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের অভাবের বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্বেগ তৈরি করে।

এই ভূমিধসের ঘটনার ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পরিষদের সমন্বয়ে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হলেও ভুক্তভোগীদের চাহিদা নিরূপণ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভুক্তভোগীরা সুনির্দিষ্ট করে নাম বলতে না পারলেও জেলা ও উপজেলা পরিষদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজে অংশ নেওয়ার কথা গবেষণা থেকে উঠে আসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার উল্লেখ থাকলেও এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আঞ্চলিক পরিষদের ভূমিকার কোনোরূপ তথ্য পাওয়া যায়নি। আবার রাঙামাটি জেলা পরিষদ আইনে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো কাজের উল্লেখ না থাকলেও জেলা পরিষদ কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে দেখা গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা (প্রথাগত কাঠামোসহ) দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির বিধায় এ ধরনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতিমালা থাকা প্রয়োজন যাতে সব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে একটি কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যেমে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা করা যায়।

জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে সমন্বিতভাবে এবং বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা করেও ভুক্তভোগীদের আর্থিক সহযোগিতা করে। মৃতদের সৎকার, আহতদের চিকিৎসা, ঘরবাড়ি মেরামত ও পুনর্বাসনের জন্য এই আর্থিক সহায়তা করা হয়। তবে প্রদত্ত এই সহযোগিতা ভুক্তভোগীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। উল্লেখ্য যে, কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কৃষি অধিদপ্তর থেকে কোনো সহযোগিতার তথ্য পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলে এত বড় দুর্যোগ এর আগে হয়নি বলে সেখানে স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্যোগের পর আহত ও উপদ্রুত মানুষদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী ভিত্তিতে আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হয়। কেস স্টাডির তথ্যদাতাদের দুইজন ছাড়া বাকি সবাই কোনো না কোনো সময়ে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়কেন্দ্র হওয়ার কারণে ভুক্তভোগীদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। কোথাও কোথাও পরিবারভিত্তিক আলাদা আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা থাকলেও সার্বিকভাবে অনেকগুলো পরিবারকে একত্রে একটি কক্ষে অবস্থান করতে হয়। তবে, আশ্রয়কেন্দ্রে তাদের অবস্থানের সময়কাল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল বলে বেশির ভাগ তথ্যদাতা মতামত দেয়। আবার অনেককে একাধিক আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হতে হয়।

গবেষণার তথ্যপ্রদানকারীদের মতামত এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাজনিত বিভিন্ন সমস্যার আলোকে কমিউনিটি পর্যায়, স্থানীয় প্রশাসন/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়– এই তিন পর্যায়ে বেশ কিছু সুপারিশের কথা উঠে আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী গাছগাছালি পুনরায় রোপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা; বনভূমি

সংরক্ষণ করা ও বেশি বেশি গাছ লাগানো; পাড়াভিত্তিক সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা; পাহাড়ের ভৌগোলিক কাঠামো ঠিক রেখে অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধ করা; যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হলে বিকল্প পন্থা চিহ্নিত করে রাখা; বর্ষা মৌসুমের আগে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি মজুত করা; বনভূমি সংরক্ষণ করা ও বেশি বেশি গাছ লাগানো; স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং স্থানীয় প্রথা-রীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবস্থাপনা করা; কমিউনিটিভিত্তিক বনভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা (ভিসিএফ) এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী গাছগাছালি রোপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সর্বোপরি, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা (প্রথাগত কাঠামোসহ) দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এই অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা খুবই জরুরি যাতে করে সব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে একটি কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যেমে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয়।

# তথ্যসূত্র


- স্টাফ রিপোর্টার (২০১৭) 'সারাদেশে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস', বাংলা ট্রিবিউন, ১২ জুন.
- মাসুদ, হুমায়ুন (২০১৭) 'প্রভাব যার, পাহাড় তার', বাংলা ট্রিবিউন, ১৪ জুন.
- স্টাফ রিপোর্টার (২০১৭) 'আতঙ্কের পাহাড়ে এখন আহাজারি আর আর্তনাদ', বাংলা ট্রিবিউন, ১৪ জুন.
- সাহা, পার্থ শংকর (২০১৭) 'পাহাড়ধসে প্রাণহানি ঠেকাতে আগাম প্রস্তুতি ছিল না', প্রথম আলো, ১৫ জুন.
- বল, প্রণব (২০১৭) 'সবুজ রাঙামাটি এখন ধ্বংসস্তূপ', প্রথম আলো, ১৫ জুন.
- Star Report, 2017, 'Hills Howl in Grief, Pain', The Daily Star, 15 June.
- Star Report, (2017) 'Horror Strikes Hill', The Daily Star, 15 June.
- Editorial (2017) 'Landslides Cause Havoc', The Daily Star, 15 June.
- Reporter (2017) 'Landslides death toll rises to 156, rescue operations called off', Dhaka Tribune, 16 June.
- Tusher, H. J. Uddin, M. and Chakma, A. (2017) 'Water, Fuel Crises Hit Rangamati', The Daily Star, 16 June.
- সাহা, পার্থ শংকর (২০১৭) 'পাহাড়ি প্রকৃতির ওপর অত্যাচার নজিরবিহীন', প্রথম আলো, ১৬ জুন.
- চাকমা, সাধন বিকাশ (২০১৭) 'সেনাসদস্যসহ আরও ৪ জনের লাশ উদ্ধার', প্রথম আলো, ১৬ জুন.
- বল, প্রণব (২০১৭) 'বিচ্ছিন্ন রাঙামাটিতে জ্বালানি সংকট, খাবারের দাম চড়া', প্রথম আলো, ১৬ জুন.
- Tusher, H. J. and Uddin, M. (2017) 'Landslides Death toll 150: Call for Rehabilitation, Relief gets Louder', The Daily Star, 17 June.
- Editor (2017) 'BD Landslide: Rangamati Hill District Struggling to Get Back to Normal', Green Watch, 17 June.
- মাহমুদ, ইফতেখার (২০১৭) 'বন উজাড় ও পাহাড় কাটার কারণেই ধস', প্রথম আলো, ১৮ জুন.

- Tusher, H. J. and Uddin, M. (2017) 'Struck by Twin Tragedy', The Daily Star, 18 June.
- Tusher, H. J. Uddin, M. and Chakma, A. (2017) 'Supplies, Prices not Normal Yet', The Daily Star, 18 June.
- বল, প্রণব ও চাকমা, সাধন বিকাশ (২০১৭) 'ঝুঁকিতে শহরের সরকারি স্থাপনা', প্রথম আলো, ১৯ জুন.
- Tusher, H. J. (2017) 'Reporter's Diary', The Daily Star, 20 June.
- বল, প্রণব (২০১৭) 'আশ্রয়কেন্দ্রে দুই সমস্যায় নারীরা', প্রথম আলো, ২১ জুন.
- মাহমুদ, ইফতেখার ও ইসলাম, রোজিনা (২০১৭) 'পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ধসের কারণ বজ্রপাত', প্রথম আলো, ২২ জুন.
- Shathi, M. C. (2017) 'Live From a Ghost Town', Star Weekend, 23 June.
- Islam, Z. (2017) 'Nobody to Blame for the Landslides', Star Weekend, 23 June.
- Reporter (2017) 'Tourists Turn Their Backs on Rangamati', The Independent, 29 June.
- আখতার, ড. সৈয়দ হুমায়ুন (২০১৭) 'আপদ ও দুর্যোগের নতুন মাত্রা পাহাড়ধস', প্রথম আলো, ১৩ জুলাই.
- চাকমা, সাধন বিকাশ (২০১৭) 'থমকে আছে জীবন', প্রথম আলো, ১৩ জুলাই.